(৮) বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা আলোচনা কর।

ভূমিকা সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও কাব্যই ছিল সাহিত্যের বাহন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের কোন স্থান ছিল না, কেবলমাত্র কথাবার্তায় দলিল দস্তাবেজে এবং এমন বিষয়ের চুক্তিতে গদ্য ব্যবহৃত হত। সম্পূর্ণ গদ্যে প্রবর্তিত মিশনারীগণই প্রথম করে গেলেন, বাংলা গদ্যের অবলম্বনে বিক্ষিপ্ত সাময়িক চেষ্টা দেখা গিয়েছিল পর্তুগীজ মিশনারিদের মধ্যে। ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পর্তুগীজরাই এদেশে প্রথম এসেছিল ব্যবসা করতে। তাদের ব্যবসার আনুষঙ্গিক লুটপাট করা, সেই সঙ্গে তারা চেয়েছিল ভারতবর্ষে বিরাট একটি খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, সেই উদ্দেশ্যে বলপূর্বক বাঙালীর উপর তারা অত্যাচার করতেও কসুর করেনি। কিন্তু এইভাবে জোর করে ধর্মান্তরিত করা যে কঠিন ব্যাপার তা তারা জানত। এদেশের ভাষা না জানলে সফলতা তাদের করতে সম্ভব হবে না ~~[illegible]~~ বুঝেছিল, তাই পর্তুগীজ পাদ্রীরা বাংলা ভাষায় দু-একখানা গ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনের দান অনেক বেশী ও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রেক্ষাপট → মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব হবার পূর্বে আমাদের দেশে হাতে লেখা পুঁথি প্রচলিত ছিল, তুলট কাগজ ও তালপাতা বা ভূর্জ পত্রে এই সব পুঁথি লিখিত হত, যাদের প্রয়োজন তারা নকল করিয়ে নিত। তখন উচ্চশ্রেণী ছিল না। জনসাধারণ সম্পন্ন লোকেদের কথকতা - কীর্তন - পাঁচালি গানের মারফত তখনকার সাহিত্য লোকের কাছে পৌঁছত,

কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে যে
প্রমাদটি থেকে যেতে পারে না, মুদ্রণ কৌশলের
মাধ্যমে মুদ্রিত গ্রন্থে সর্বত্র অবিকল লিখিত
লেখক সাধারণ পাঠকের হাতে মুদ্রিত পুস্তক
দ্বারা [struck-out words] তাদের প্রামাণিকতা নির্ধারণ
করতে হয় না, মুদ্রণযন্ত্র প্রবর্তনের ফলে সমাজে
কিন্তু মুদ্রণ শিল্প প্রস্তুত করে, নতুনভাবে বই
ছাপাতে মূল বইয়ের পরিবর্তন করতে পারে,
কিন্তু মুদ্রিত বইয়ের পরিবর্তন সম্ভব,
ছাপাতে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য
ঐ-হেড কর্মচারী মুদ্রণযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা
অনুভব করেছিলেন, ফলে হ্যালহেডের
ব্যাকরণ বইটি প্রথমে মুদ্রিত হয়,
উইলকিন্স বাংলা হরফ তৈরি করে দেন,
শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার তার কাছ
থেকে হরফ তৈরি শিখে বাংলায়
একটি কারখানা করেন।

পুস্তকাবলী → কেরী ও টমাস,
ওয়ার্ড ও মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম
প্রচারের জন্য দেশী ভাষার আশ্রয় নিতে মনস্থ
করেন। ১৮০০ সালে কেরী ও মার্শম্যান 'সমাচার
মাতিউর রচিত' (St. Mathew's Gospal) মুদ্রিত
করে প্রকাশ করেন, ১৮০১ সালে যথাক্রমে
New Jestament ও Old Jestament
এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত
হয়, ১৮০৯ সালে 'ধর্মপুস্তক' নামে সমগ্র
বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু এর
ভাষা ছিল অত্যন্ত জড় ও কৃত্রিম, বাংলার
নিজস্ব বাক্যরীতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে
ইংরাজি শব্দবিন্যাসের অনুসরণ করায় এ গদ্য

পরবর্তী বাঙালীদের কাছে পরিশ্রমের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সাহিত্যের দিক থেকে শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর প্রেসের ভূমিকা উল্লেখ্য নয়, কিন্তু এদের প্রচেষ্টায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এবং বহুমূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালীর কাছে শ্রীরামপুর মিশন অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তা ছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, বাংলা ইংরাজি অভিধান, বাংলা সাময়িকপত্র এই মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, বাংলাদেশের উন্নতিতে এদের উৎসাহ অস্বীকার করা চলে না, বহুমূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও মুদ্রণে কেরী ও তার সহকর্মীবৃন্দের প্রয়াসছিল প্রশংসনীয়।

কার্যকলাপঃ তখনকার দিনে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের প্রচেষ্টায় যে মুখ্য দুঃসাহসিক ছিল সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, বাংলা ভাষায় এই দুঃসাহসিক কাজের ভিতর দিয়েই বাংলা গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, সুতরাং আধুনিক বাংলা গদ্যের সঙ্গে এবং শান্তিতে বসিয়ে তাঁকে বিচার করতেছিল অন্যান্যসম্পর্কে, শুধু বাইবেলের অনুবাদই নয়, মিশনারি প্রকাশ করেছিল (সমাচার দর্পণ) নামে একটি সাপ্তাহিক আর (দিগ্দর্শন) নামে একটি মাসিক পত্রিকা, এই ~~[illegible]~~ মিশনারি সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ছিল, এগুলি গ্রন্থের তখনকার প্রকাশিত গ্রন্থসার ~~[illegible]~~ সকল এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ সুবিধা করতে হয়েছিল তা তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এগুলির মধ্যে কি আবেদন রয়েছে এবং শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ সেকথা

অনুসন্ধানকার্য,

সমালোচনাঃ

শ্রীরামপুর মিশনারীদের মধ্যযুগ বাংলাসম্পর্কে বাংলা মুদ্রণের প্রাথমিক ইতিহাস আছে, বাংলা গদ্য প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামপুর মিশনের কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, ১৭ শ শতাব্দী থেকেই রোমান-ক্যাথলিক, পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা ধর্মান্তরীকরণের জন্য বাংলাদেশে এসে জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই গোয়ার পর্তুগীজ কেন্দ্র থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলাদেশে প্রেরিত হতেন। কাজের সুবিধার জন্য তারা বাংলা ব্যাকরণ - অভিধান ও কিছু কিছু প্রচারপুস্তিকা বাংলাগদ্যে রচনা করেন, কিন্তু মিশনারিদের বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম হলে প্রথমে ইংরেজ প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজকদের আনাগোনা শুরু হয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার, প্রথমদিকে প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজকদের কোম্পানির এলাকায় ধর্মপ্রচার করতে দেওয়া হত না, কারণ তাদের ধারণা ছিল, তাহলে দেশীয় প্রজাসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে কোম্পানির শাসন বিপন্ন করতে পারে। তাই কলকাতা বা কাছাকাছি ~~[illegible]~~ কোম্পানির কোন অঞ্চলে কোন মিশনারী ধর্মপ্রচার করতে পারতেন না, লুকিয়ে চুরিয়ে করত, তাই কেরী-প্রবর্তিত শ্রীরামপুর মিশন কোম্পানির এলাকার বাইরে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়, লণ্ডনের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির ফলে এ দেশে মিশনারী ও স্কুল মাস্টারদের

মিশনারিদের অনুমোদিত ~~[illegible]~~ গ্রন্থ,

উপসংহার →

মিশন থেকে যে সমস্ত বাংলা পুস্তক প্রকাশিত মুদ্রিত হয়েছিল, তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার বর্জিতই হবে, তাঁরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, এজন্য তাঁরা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়েছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করে তারা বাঙালী সমাজের যত অসুবিধা দূর করেছিলেন, প্রবর্তনকালে কলকাতার কাগজের বদলে শ্রীরামপুর থেকে বহু সরকারী কাগজপত্র ছাপিয়ে আনতেন, এজন্য শ্রীরামপুর মিশনের কর্তৃপক্ষ, বিশেষত উক্ত উইলিয়াম কেরী ও তাঁর সহযোগীগণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন,

* * * * *

SUNDAY 17

গদ্যকার অক্ষয়কুমার দত্ত : চারুপাঠ:

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ঠিক আগের যুগটিকে বলা হয় 'তত্ত্ববোধিনী'র যুগ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন এই সারস্বত সমাজের কেন্দ্রীয় পুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্বের মধ্যে বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ কোন পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল তা জানতে হলে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমারের গদ্য রচনাবলীর পরিচয় প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর যেমন বর্ননাত্মক গদ্যের রূপ শিল্প সুষমামন্ডিত করে তুলেছিলেন,

অক্ষয়কুমারও তেমনি আধুনিক মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধে জ্ঞানচর্চার ভাষারূপে বাংলা গদ্যের সামর্থ্য ও শক্তি নিঃসংশয়িতভাবে প্রমান করেছেন। অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা আবিষ্কার করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তিনিই তাঁকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বারো বছর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। * ①

মানসিক গঠনের দিক থেকে অক্ষয়কুমার ছিলেন বৈজ্ঞানিক। *(2) তথ্য প্রমান বিশ্লেষনের দ্বারাই তিনি জগৎ ও জীবনের সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। *(3) অক্ষয়কুমারের রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে ~~প্রসিদ্ধ~~ প্রসিদ্ধি বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সমন্ধ বিচার এবং ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়। ভাষাকে শিল্পশ্রী মণ্ডিত করার দিকে অক্ষয়কুমারের চেষ্টা ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গদ্যের বিষয় সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপন করা। *(4) তাঁর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষনায় বাঙালী মনিষীর প্রথম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। *অক্ষয়কুমারের অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য পদার্থবিদ্যা (১৮৪৫) এবং চারুপাঠ। চারুপাঠ তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়। ১ম-(১৮৫৩), ২য়-(১৮৫৯) এবং তৃতীয় চারুপাঠ দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় 'চারুপাঠ'ই তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থ।